পররাষ্ট্র দপ্তরের পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল বিষয়ক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা

প্রেক্ষাপট ব্রিফিং
প্রেস করেসপন্ডেটস রুম
ওয়াশিংটন, ডিসি
নভেম্বর ১৫, ২০১৯

সঞ্চালক: আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি...ইনি পররাষ্ট্র দপ্তরের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা...। সম্প্রতি দূরপ্রাচ্য সফর থেকে ফিরেছেন। প্রথমে তিনি কিছু কথা বলবেন এবং তারপর প্রশ্নোত্তর পর্বে যাবেন।

এটি প্রেক্ষাপট হিসেবে ধরা হবে। পুরো বিষয়টি বলা হচ্ছে পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার তরফ থেকে, ঠিক আছে?

পররাষ্ট্র দপ্তরের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা: আমরা কি এগুলো এখনই বিতরণ করবো, না আপনি চান...

স্টাফ: হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আপনি যেমনটা চান...।

পররাষ্ট্র দপ্তরের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা: উনি এগুলো বিতরণ করতে করতে জানিয়ে রাখি, আমি আজ পাঁচ মাস ধরে এ দায়িত্ব পালন করছি। ওই অঞ্চলে এটা আমার চার নম্বর সফর। কখনো কখনো সফরগুলোর পরিকল্পনা হয় ঘটনা বা কার্যকলাপের ভিত্তিতে (এ ঘটনায় যেমন পূর্ব এশীয় শীর্ষ সম্মেলন, জাপানের 'ফুজি সংলাপ' ও অন্য কিছু বিষয়) এবং অন্যান্য সময়ে তা হয় বৃহত্তর একটি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে গিয়ে উপস্থিতি জানান দেওয়া তথা কাজকর্ম করা।

কাজেই আমি বলবো, এটা একটা দারুণ জায়গা। আমরা ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল প্রতিবেদনও দিচ্ছি। আমরা এ পর্যন্ত কেমন করছি তা-ই তুলে ধরা হয়েছে এ প্রতিবেদনে। এছাড়া যতটা পারি আপনাদের হালনাগাদ করা অব্যাহত রাখার কথা ভাবছি। প্রেস ব্রিফিং এবং এ ধরনের কাগজপত্র দিয়ে দু'ভাবেই।

আমার অন্যতম সত্যি বলতে কী, সবচেয়ে বড় অগ্রাধিকার হচ্ছে বার্তা দিয়ে যাওয়া। আপনাদের কাছে, ওই অঞ্চলের কাছে, কার্যত যারই বিষয়টা জানা দরকার তাদের কাছেই আমি যতটা সম্ভব স্পষ্টভাবে বিষয়টা জানাতে চাই। মুখ বন্ধ রেখে লোকজনকে আমাদের ভাবনা বা কার্যক্রম সম্পর্কে অনুমান বা গুঞ্জনের সুযোগ দিতে চাই না। তো, আজ এখানে আসা এবং স্পষ্ট কথাটা প্রকাশের সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ।

আমি আপনাদের লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনাতে চাই। কারণ দুই সপ্তাহ সময়ের মধ্যে ছয়ছয়টি সফর করতে হয়েছে। কিছু সময় পর অনেক কিছুই ঝাপসা লাগে। আমি তাই সফরের প্রতিটি পর্বের মূল পয়েন্টগুলো উল্লেখ করে যাবো। এরপর আমরা সুনির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য প্রশ্নোত্তর পর্বে যেতে পারবো।

শুরুতেই আমি টোকিওর মাউন্ট ফুজি সংলাপের কথা বলতে চাই। সেখানে বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলেছি আমি। সাবেক জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ম্যাকমাস্টার ফুজি সংলাপে উপস্থিত ছিলেন। তার সঙ্গে কথা বলা ও মতবিনিময়ের চমৎকার সুযোগ ছিল এটা। এছাড়া এ আয়োজনের পার্শ্বঘটনা হিসেবে জাপানের জ্যেষ্ঠ নেতাদের সঙ্গে ভালো আলোচনা হয়েছে আমাদের।

সব আলোচনাতেই আমি জোর দিয়ে বলেছি, যুক্তরাষ্ট্র-জাপান মৈত্রী হচ্ছে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে শান্তি, নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির ভিত্তি। আরও বলেছি যে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জাপানের সঙ্গে আমাদের বরাবরের গুরুত্বপূর্ণ মৈত্রী জোরদার করতে দেশটির সঙ্গে কাজ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। আমরা ২০২০ সালে এ মৈত্রীর ৬০তম বার্ষিকী উদযাপনের বিষয়েও আলোচনা করেছি।

বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমি জোর দিয়ে বলেছি যে, আমাদের সম্প্রতি স্বাক্ষরিত বাণিজ্য চুক্তি কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস এবং ন্যায্যতাকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করবে। ফাইভজি ও ডেটা নিরাপত্তা বিষয়ে জাপানের সঙ্গে সহযোগিতার ব্যাপারেও আলোচনা করেছি আমরা। আমি জোর দিয়ে বলেছি, ডিজিটাল বাণিজ্যের ব্যাপারে নতুন চুক্তি দুদেশের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ডিজিটাল বাণিজ্য বৃদ্ধি করবে।

বৃহত্তর অঞ্চলের ক্ষেত্রে আমি ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে অর্থনৈতিক বিষয়, নিরাপত্তা, শাসনপ্রক্রিয়া ও মানবসম্পদের ক্ষেত্রে এত গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হওয়ার জন্য জাপানকে ধন্যবাদ দিয়েছি।

উত্তর কোরিয়া প্রসঙ্গে আমি জাপানকে আবারও আশ্বস্ত করে বলেছি যে, মিত্রদের সুরক্ষার ব্যাপারে আমাদের অঙ্গীকারের দৃঢ়তা ইস্পাতকঠিন। আমি বলেছি, আমাদের নিজেদের ও মিত্রদেরকে কোনো হামলা বা উস্কানি থেকে রক্ষা করতে যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তুত রয়েছে। জাতিসংঘ নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নের মাধ্যমে উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে চাপ প্রয়োগের উদ্যোগে বলিষ্ঠ সহযোগিতার জন্য জাপানকে ধন্যবাদ দিয়েছি। বিশেষ করে জাহাজ থেকে জাহাজে অবৈধ কয়লা ও পেট্রোলিয়াম স্থানান্তর ঠেকানোর ক্ষেত্রে।

আমি আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের বলেছি, আমরা নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব কার্যকর করার লক্ষ্যে ওকিনাওয়াতে যুক্তরাষ্ট্র ও মিত্রদের যুদ্ধবিমান রাখার জন্য জাপানের ভূমিকার প্রশংসা করি। জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া সম্পর্ক বিষয়ে বলতে গিয়ে আমি উত্তর কোরিয়ার সাম্প্রতিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের প্রেক্ষাপটে জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার নিরাপত্তা সহযোগিতা ও তথ্য ভাগাভাগির গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছি। আমি তাদের বলেছি, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হলে বিজয়ী হয় কেবল পিয়ংইয়ং, মস্কো আর বেইজিং।

সেখান থেকে গিয়ে আমরা মিয়ানমারে (বার্মায়) প্রায় তিনদিনের মতো কাটাই। নেপিডোতে রাষ্ট্রীয় কাউন্সেলর অং সান সুচিসহ জ্যেষ্ঠ সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাত করেছি। আমি রাখাইন প্রদেশে অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত লোকদের একটি শিবিরে যাই এবং সরাসরি সেখানকার রোহিঙ্গাদের কথা শুনি।

আমি রেঙ্গুনে বার্মার নাগরিক সমাজের নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাত করি এবং আরও শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক পথে বার্মার চলমান অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করি।

এসব সাক্ষাতে আমি বার্মার গণতন্ত্রের পথে উত্তরণ ও অর্থনৈতিক রূপান্তরের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের কয়েক দশকের দীর্ঘ সমর্থনের কথা পুনর্ব্যক্ত করেছি।

এ সফর থেকে বার্মা ও যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে শক্তিশালী মেলবন্ধন ও পরস্পরের জন্য শুভকামনার অনুভূতির ছোঁয়া পেয়েছি আমি।

রাজধানী নেপিডোতে আমরা দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের সামনে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ এবং এগুলো কাটিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার উপায় নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেছি। মিয়ানমারকে অবশ্যই রোহিঙ্গা ও অন্যান্য জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর জন্য পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং বার্মার ভেতরে বাস্তুচ্যুত ও বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া উদ্বাস্তুদের নিরাপদ, স্বেচ্ছামূলক, মর্যাদাপূর্ণ ও টেকসই প্রত্যাবর্তনের পরিবেশ সৃষ্টি করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে।

এর বাইরে আমরা রাখাইন, শান ও কাচিন রাজ্যসহ বার্মার অনেক অঞ্চলে চলমান সহিংসতা, জাতীয় শান্তি প্রক্রিয়া আবার চাঙা করার প্রয়োজনীয়তা এবং সব সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর সহিংসতার নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছি। এসব অঞ্চলের বাস্তুচ্যুত মানুষের কাছে মানবিক সহায়তা নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা অব্যাহত রাখা বিশেষভাবে পীড়াদায়ক। আমি বড় ধরনের মানবাধিকার লংঘনের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের জবাবদিহি নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর আবারও জোর দিয়েছি।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা সম্পর্ক গভীর করার সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলো নিয়ে কথা বলেছি, যার মধ্যে ছিল দায়িত্বশীল বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন। এটি অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নততর ব্যবসায়িক আচরণকে এগিয়ে নিতে পারে। সামরিক বাহিনীর অর্থনৈতিক স্বার্থ নিয়ন্ত্রিত করতেও সহায়তা করতে পারে এটি।

বার্মায় শিগগিরই সাধারণ নির্বাচন হতে যাচ্ছে যা হবে কয়েক দশকের মধ্যে দেশটির দ্বিতীয় নির্বাচন। আমরা এতে প্রধান দাতা। কয়েক দশকের বিচ্ছিন্নতা ও সামরিক শাসন থেকে বার্মার বেরিয়ে আসার অন্তর্বর্তীকাল চলছে। এসময় দেশটিকে সহায়তা অব্যাহত রাখার অংশ হিসেবে আমরা ২০২০ সালের নভেম্বরের নির্বাচনের জন্য ২ কোটি ৪০ লাখ ডলার দিচ্ছি।

আলাপ-আলোচনার সময় আমি ওই অঞ্চলের ভূরাজনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলোর ব্যাপারে শুনেছি। সহযোগীদের বলেছি, বার্মার জনগণের অবস্থার উন্নয়নের জন্য জটিল জাতীয় ও আঞ্চলিক চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলায় যুক্তরাষ্ট্র তাদের নিয়ে কাজ করবে।

সার্বিকভাবে বললে, এ সফরটি সামনের উল্লেখযোগ্য মাত্রার চ্যালেঞ্জগুলো সম্পর্কে আমাকে সচেতন করেছে। তবে একত্রে অগ্রগতি সাধন করতে পারলে যে উন্নততর ভবিষ্যতের সুযোগ রয়েছে তাও একইসঙ্গে তুলে ধরেছে। বার্মা সামরিক স্বৈরতন্ত্রের অন্ধকার সময় পেছনে ফেলে এগিয়ে চলায় ক্রমেই

দেশটির বেশি সংখ্যক মানুষ ভাগ্য উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করছে। এ প্রসঙ্গে বলা দরকার, এটি শুধু যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগ নয়, ওই অঞ্চলে সহযোগী জাপান, কোরিয়া ও অন্য দেশগুলোর কাছ থেকে আমরা অনেক সমর্থন পাচ্ছি। আমি সানন্দে এ বিষয়ে আলোচনা করতে পারি।

এর পর আমি যাই কুয়ালালামপুরে। ৩১ শে অক্টোবর দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করি। এ সময় আমি বাণিজ্য, নিরাপত্তা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে আমাদের বৈচিত্রপূর্ণ অংশীদারত্বের কথা জোরের সঙ্গে পুনর্ব্যক্ত করি। একই দিনে আমি মালয়েশিয়ার ইন্সটিটিউট অব স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ-এ বক্তব্য দিয়েছি। আমি আনন্দের সঙ্গে জানাই যে, ওয়ানএমডিবি দুর্নীতি কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্ত একশ' কোটি ডলার উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে যা মালয়েশিয়ায় ফেরত আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। এ ঘটনা মালয়েশিয়ায় দুর্নীতি মোকাবেলা এবং জাতীয় সমৃদ্ধি ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে দেশটির সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের চলমান সফল সহযোগিতার সম্পর্ককেই তুলে ধরছে।

যুক্তরাষ্ট্র ও মালয়েশিয়ার সামরিক বাহিনীদ্বয়ের শক্তিশালী সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে ৩১শে অক্টোবর আমি দেশটির উপ প্রতিরক্ষামন্ত্রী লিউ চিন টংয়ের সঙ্গেও সাক্ষাত করি। প্রতি বছর আমরা একসঙ্গে যে নয়টি সামরিক মহড়া করি তা এ সম্পর্কের সাক্ষ্য বহন করে। আর কোনো দেশের সঙ্গেই মালয়েশিয়া বছরে এতগুলো মহড়া করে না।

আমরা মালয়েশিয়ার সমুদ্র বিষয়ক সামর্থ্য বাড়ানোর অভিন্ন লক্ষ্য নিয়ে আলোচনা করেছি। মালয়েশিয়াই আমাদের 'সামুদ্রিক নিরাপত্তা উদ্যোগ' তহবিলের বৃহত্তম প্রাপক। আমরা মালয়েশিয়ার সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের জন্য এক্সচেঞ্জ সুযোগ সম্প্রসারণের পন্থাও খুঁজে দেখেছি। ২০২০ অর্থবছরে আমরা মালয়েশিয়াকে আইএমইটি'র (ইন্টারন্যাশনাল মিলিটারি এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং) আওতায় ১৫ লাখ ডলার দিচ্ছি।

ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল বিষয়ে জানাতে চাই, ৩১শে অক্টোবর আমি মালয়েশিয়ার বিনিয়োগ ও উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান আবদুল মজিদের সঙ্গে সাক্ষাত করি। তার সঙ্গে আলোচনায় আমি ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে অবকাঠামো, জ্বালানি ও ডিজিটাল অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিনিয়োগ আকর্ষণের ব্যাপারে আমাদের মনোযোগের বিষয়টি তুলে ধরি। চীনের সঙ্গে মালয়েশিয়ার অবকাঠামো প্রকল্পগুলোর পর্যালোচনার প্রেক্ষাপটে আমি উচ্চমানের স্বচ্ছতা ও আর্থিক বজায়যোগ্যতার আহ্বান জানিয়েছি। উঁচুমানের বেসরকারি খাতের নেতৃত্বাধীন উন্নয়ন উদ্যোগ আকৃষ্ট করার পাশাপাশি যেন মালয়েশিয়ার সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ থাকে তা নিশ্চিত করাই এর উদ্দেশ্য।

১ নভেম্বর আমি আমেরিকা চেম্বার অব কমার্স সদস্যদের সঙ্গে প্রাতঃরাশ বৈঠকে মিলিত হই। এতে মালয়েশিয়ায় বিনিয়োগের সময় যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যবোধের প্রতিনিধিত্ব করা অব্যাহত রাখতে দেশের কোম্পানিগুলোর প্রতি আহ্বান জানাই। আমি এ সময় উল্লেখ করি যে, যুক্তরাষ্ট্র এখন মালয়েশিয়ায় বিদেশি বিনিয়োগের বৃহত্তম উৎস। মালয়েশিয়ায় শুধু ২০১৯ সালের প্রথমার্ধেই যুক্তরাষ্ট্রের ২শ' ৮০ কোটি ডলার বিনিয়োগ অনুমোদিত হয়েছে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপ প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে আমি উল্লেখ করি, চীনের নাইন ড্যাশ লাইন সাগর অঞ্চলের স্বাধীনতা এবং নিয়মনীতি তথা নীতিভিত্তিক ব্যবস্থার প্রতি সরাসরি হুমকি। আমি যুক্তরাষ্ট্রের এ অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করি যে, আমরা সংঘাত চাই না, তবে আমাদেরকে সমুদ্র বিষয়ে চীনের অবৈধ দাবিকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে।

মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের মানবাধিকার পরিস্থিতিতে যে চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি হয়েছে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপ প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে আমি সে বিষয়ে কার্যকরভাবে সাড়া দেওয়ার উপায় নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা করেছি। অন্যদিকে মালয়েশিয়াকে আহ্বান জানিয়েছি মানুষকে জোরপূর্বক ফেরত না পাঠানোর নীতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে।

মালয়েশিয়া থেকে আমরা পূর্ব এশীয় শীর্ষ সম্মেলন ও দ্বিপক্ষীয় কার্যক্রমের জন্য ব্যাংককে যাই। এই সফরটি থাইল্যান্ডের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক আরও জোরদার করার ভালো সুযোগ করে দিয়েছে। থাইল্যান্ড এশিয়ায় আমাদের এক গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী ও দীর্ঘদিনের মিত্র। দেশটিতে গত পাঁচমাসে এটি তৃতীয় সফর যা থাইল্যান্ড ও এর জনগণের সঙ্গে আমাদের পরীক্ষিত বন্ধুত্ব অক্ষুণ রাখতে যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীকারের প্রতিফলন। দ্বিপক্ষীয় বৈঠকগুলো গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ও মানবাধিকারকে সমুন্নত রাখার ব্যাপারে থাইল্যান্ডের অব্যাহত অগ্রগতির প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনকে জোরদার করেছে। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাকে সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে অগ্রগতি অব্যাহত থাকা থাইল্যান্ডের সঙ্গে আমাদের অংশীদারত্বের জন্য অপরিহার্য।

থাইল্যান্ডের পার্লামেন্ট সদস্যদের সঙ্গে আবার সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছে আমার। দেখা যাচ্ছে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া কাজ করছে। তারা থাইল্যান্ডের পার্লামেন্টে বিভিন্ন মত ও কণ্ঠস্বরের বৈচিত্রকে স্বাগত জানান। পার্লামেন্ট সদস্যদের সঙ্গে থাইল্যান্ডের আইন, বিচার ও মানবাধিকারের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে আমার। তাদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পেয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছি আমি। এদের অনেকেই প্রথমবারের মতো কোনো নির্বাচিত পদে বসেছেন।

থাইল্যান্ডে আমরা নাগরিক সমাজ ও বেসরকারি সংগঠনগুলোর সঙ্গেও বসেছি। আলোচনায় তাদের সামনেকার সুযোগ ও কার্যক্রমের চ্যালেঞ্জগুলো উঠে আসে। আমরা ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলজুড়ে নাগরিক সমাজের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র সম্ভাব্য যেসব কাজ করতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করেছি। থাইল্যান্ডের সরকার, বিরোধী দলসমূহ ও নাগরিক সমাজের সঙ্গে বৈঠকে আমরা বার্তা দিয়েছি যে, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে অবশ্যই শক্তিশালী করতে হবে। সেই সঙ্গে সম্মান জানাতে হবে মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারকে।

থাইল্যান্ডে থাকাকালে আমি স্থায়ী সচিব বুসায়া মাথেলিনের সঙ্গে তৃতীয়বারের মতো সাক্ষাত করেছি। এসময় আমি এবছর আসিয়ানের চেয়ারম্যান হিসেবে সাফল্যের জন্য থাইল্যান্ডকে অভিনন্দন জানাই। এজন্য প্রচুর কাজ করতে হয়েছে তাদের। আমি পূর্ব এশীয় শীর্ষ সম্মেলনের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র সরকার ও আমাদের ব্যবসায়ী মহলের সঙ্গে দারুণভাবে কাজ করে যৌথভাবে ইন্দো-প্যাসিফিক বিজনেস ফোরাম আয়োজন করার জন্যও থাইল্যান্ডকে ধন্যবাদ দিই।

পূর্ব এশীয় শীর্ষ সম্মেলনের ব্যাপারে বলতে গেলে থাইল্যান্ড খুবই সফল। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ও'ব্রায়েন প্রেসিডেন্টের বিশেষ দূত হিসেবে বলেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আসিয়ান নেতাদের ২০২০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে একটি বিশেষ শীর্ষ সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ব্যাংককে ও'ব্রায়েন লাওস, মিয়ানমার, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামসহ বিভিন্ন দেশের নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন।

শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ আসিয়ানের পেছনে সমর্থন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল বিষয়ে আসিয়ানের দৃষ্টিভঙ্গি, এ অঞ্চল সম্পর্কে আমাদের দূরকল্প এবং স্বচ্ছতা, অন্তর্ভুক্তি, সুশাসন ও আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধার বিষয়গুলোকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে এ অঞ্চল নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র এবং তার সহযোগীদের দূরকল্পকে আমরা এক রেখায় মিলতে দেখি। আমরা এ অঞ্চলের ওপর কিছু সময় ব্যয় করব, কারণ এটা ছিল ব্যাংককে অনেক কাজ করেছি আমরা।

আসিয়ান অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (এফডিআই) ২৭১ বিলিয়ন ডলার যা চীন ও জাপানে আমাদের সম্মিলিত এফডিআইয়ের চেয়েও বেশি। ব্যাংককে আমরা ঘোষণা করি যে, আসিয়ানের সিঙ্গল উইন্ডোকে যুক্তরাষ্ট্রের ইলেকট্রনিক কাস্টমস ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করার আলোচনা শুরু হয়েছে। এটি আসিয়ান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বার্ষিক ৩৩৪ বিলিয়ন ডলারের দ্বিমুখী বাণিজ্যের সংস্থান করবে। কাজেই ২৭১ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ আসবে এবং ৩৩৪ বিলিয়ন ডলার দ্বিমুখী বাণিজ্য হবে।

নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আমরা দক্ষিণ চীন সাগরে চীনের জবরদস্তিমূলক আচরণ যেভাবে আসিয়ানের দেশগুলোকে তেল, গ্যাস ও মৎস্যসম্পদ আহরণ করতে বাধা দিচ্ছে তা নিয়ে আলোচনা করেছি। তিন বছরে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা সহায়তা ছিল ১শ' ৩০ কোটি ডলার যার বেশিরভাগই গিয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। প্রথম আসিয়ান-যুক্তরাষ্ট্র সামুদ্রিক মহড়া ও যুক্তরাষ্ট্র-আসিয়ান সাইবার পলিসি ডায়ালগ আমাদের কৌশলগত অংশীদারত্বকে এগিয়ে নিয়েছে।

মানবসম্পদের ক্ষেত্রে আমাদের ইয়াং সাউথইস্ট এশিয়া লিডারশিপ ইনিশিয়েটিভ (ওয়াইএসইএএলআই) এবং যুক্তরাষ্ট্র-আসিয়ান ইন্টার্নশিপ কর্মসূচি আমাদের জনগণকে কাছাকাছি আনছে। এছাড়া আমরা ডিজিটাল অর্থনীতি ও উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে তৃণমূল পর্যায়ে সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নয়নকে এগিয়ে নিতে 'আসিয়ান ইনোভেশন সার্কেল' চালু করেছি।

কাজেই পূর্ব এশীয় শীর্ষ সম্মেলনের পাশাপাশি থাইদের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'ইন্দো-প্যাসিফিক বিজনেস ফোরাম' ছিল দারুণ সাফল্য। আমরা এতে থাইল্যান্ডের সহায়তার প্রশংসা করি। আমরা যুক্তরাষ্ট্র ও ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের প্রায় এক হাজার ব্যবসায়ী নেতা ও জ্যেষ্ঠ সরকারি কর্মকর্তাকে পেয়েছি এ ফোরামে। যুক্তরাষ্ট্রের দিকে আমরা পেয়েছিলাম বাণিজ্যমন্ত্রী উইলবার রস, আন্ডার সেক্রেটারি অব স্টেট কিথ ক্রাচ এবং ইউএসএআইডি, ওপিআইসি, এক্সিম ব্যাংক, ইউএসটিডিএ, অর্থদপ্তর ও সরকারি অন্যান্য সংস্থার জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের। যুক্তরাষ্ট্রের ১৭ জন রাষ্ট্রদূত ও মিশনপ্রধানও এজন্য স্বাগতিক দেশের

প্রতিনিধিদল নিয়ে ব্যাংককে এসেছিলেন। তারা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য শত শত কোটি ডলারের নতুন নতুন চুক্তিকে এগিয়ে নিয়েছেন। আমি সবাইকে 'ইন্দো-প্যাসিফিক বিজনেস ফোরাম'-এ বিতরণ করা ফ্যাক্ট শিটটি পড়তে উৎসাহিত করব। আমি নিজে এটা পড়ছি না। আপনারা ওখানেই তথ্যগুলো পাবেন। ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল নিয়েও একটা বড় প্রতিবেদন প্রকাশ করেছি আমরা। সেটাও আপনাদের দেওয়া হবে। ওই অঞ্চলে মিত্র ও অংশীদারদের সঙ্গে আমরা যা যা করছি তা-ও আপনারা জানতে পারবেন।

আর আছে দুটি যাত্রাবিরতি- কোরিয়া ও তারপর চীন

কোরিয়ায় সিউলে জ্যেষ্ঠ দক্ষিণ কোরীয় নেতাদের সঙ্গে আমার ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। এসব আলোচনায় দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে আমাদের মৈত্রীর বিষয়টি পুনর্ব্যক্ত করেছি। এটি এখনো ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তার চাবিকাঠি। দক্ষিণ কোরিয়ার জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সঙ্গে জাপান বিষয়ে আলোচনায় আমি আমাদের সম্মিলিত নিরাপত্তার ক্ষেত্রে জিএসওএমআইএ-র গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছি। দক্ষিণ কোরিয়াকে এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভাগাভাগি চুক্তিটি বাতিল না করার অনুরোধ জানিয়েছি আমি। আমরা যুক্তরাষ্ট্র-দক্ষিণ কোরিয়া-জাপান ত্রিপক্ষীয় সহযোগিতার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেছি। যুক্তরাষ্ট্র আমাদের এই গুরুত্বপূর্ণ মিত্রদের মধ্যে মধ্যস্থতা করতে যাচ্ছে না। তবে আমি স্পষ্টভাবে বলেছি, যুক্তরাষ্ট্র এ বিষয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রাখবে। আমরা দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানকে উত্তেজনা হ্রাস করে তাদের মতপার্থক্যের সৃজনশীল সমাধান বের করতে তাগিদ দেওয়া চালিয়ে যাবো। আমরা মধ্যস্থতা করবো না। তার মানে কিন্তু এই নয় যে, আমরা এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকবো না। সত্যি বলতে, আজ সকালেই আমি আরেকটি বৈঠক করেছি এ নিয়ে। আমরা উভয়পক্ষকে (কোরিয়া ও জাপান) অতীতের মতো কার্যকর সম্পর্কের পথে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে তাগিদ দেওয়া অব্যাহত রেখেছি।

অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, দক্ষিণ কোরিয়ায় থাকতে আমি আন্ডার সেক্রেটারি কিথ ক্রাচের সঙ্গে কোরীয় ব্যবসায়ী নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাত করেছি। আন্ডার সেক্রেটারি কিথ ক্রাচ যুক্তরাষ্ট্র-দক্ষিণ কোরিয়া সিনিয়র ইকনমিক ডায়ালগ এর জন্য সিউল গিয়েছিলেন। যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়া একটি যৌথ বিবৃতি দিয়েছে। এতে আমাদের দ্বিপক্ষীয় অর্থনৈতিক সম্পর্কের শক্তি এবং দুদেশের বলিষ্ঠ অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের সম্প্রসারণ অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়।

সিউলে এসব বৈঠক ছাড়াও আমি ব্যাংককে পূর্ব এশীয় শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে আমার দক্ষিণ কোরীয় প্রতিপক্ষের সঙ্গে বসেছি। সেখানে আমরা ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র-দক্ষিণ কোরিয়া সহযোগিতাকে তুলে ধরে একটি যৌথ তথ্যপত্র প্রকাশ করেছি। যুক্তরাষ্ট্র-দক্ষিণ কোরিয়া দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদারের উপায়সমূহ নিয়ে আলোচনা করেছি। এর মধ্যে ছিল আমাদের ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল ও

কোরিয়ার 'নিউ সাউদার্ন পলিসি'র মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সহযোগিতা। এ দুটির মধ্যে অনেক অভিন্ন বিষয় রয়েছে।

শেষ বিরতি ছিল বেইজিংয়ে। বেইজিংয়ে আমি চীনা প্রতিপক্ষ উপ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেং জেগুয়াংয়ের সঙ্গে ফলপ্রসূ বৈঠক করেছি। অনেক ধরনের বিষয় নিয়ে কথা বলেছি আমরা। জোর দিয়ে বলেছি যে, আমরা চীনের সঙ্গে একটি গঠনমূলক, ফলভিত্তিক সম্পর্ক চাই। তবে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে দৃষ্টিগ্রাহ্য অগ্রগতি দেখতে হবে। ভাইস প্রেসিডেন্ট পেন্স এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী পম্পেও সাম্প্রতিক কিছু বক্তব্যে যেমনটা করেছেন, তেমনিভাবে আমিও চীন সরকারের সঙ্গে আমাদের মতপার্থক্যরে বিষয়ে খুব খোলামেলা কথা বলেছি। তবে যেখানে বিষয়টি আমাদের অভিন্ন স্বার্থের জন্য ভালো, উভয়ের স্বার্থের জন্য ভালো সেখানে সহযোগিতার ব্যাপারে আমরা খুবই আগ্রহী।

হংকং ও শিনজিয়াংয়ের ব্যাপারে চীনের কাছে আমাদের উদ্বেগের কথা আমি দেশটির উপপররাষ্ট্রমন্ত্রীকে জানিয়েছি। বেইজিংকে অবশ্যই হংকংয়ে সংযম চর্চা অব্যাহত রাখতে হবে। তাদের চীন-যুক্তরাজ্য যৌথ ঘোষণায় উল্লেখিত অঙ্গীকারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আচরণ করতে হবে। হংকংয়ের স্বায়ত্তশাসনকে দুর্বল করার চেষ্টা অব্যাহত রাখা হলে তা কেবল উত্তেজনার আগুনে ঘি-ই ঢালবে।

একইভাবে শিনজিয়াং প্রসঙ্গে আমি মুসলিম সংখ্যালঘুদের ওপর নিপীড়নের বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান উদ্বেগে সাড়া দেওয়ার জন্য চীনকে আহ্বান জানিয়েছি।

পারস্পরিক লেনদেনের বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে। যে কোনো কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে লেনদেনের বিষয়টি অত্যাবশ্যকীয়। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এ ব্যাপারে বরাবরই খুব স্পষ্ট। তিনি বলেছিলেন, পারস্পরিক লেনদেন তার প্রিয় শব্দ। কাজেই এটা চীনে যুক্তরাষ্ট্রের ক'টনীতিকদের কাজ করার স্বাধীনতাই হোক, আর যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ হওয়া চীনা নাগরিকদের ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে দেশটির দায় মেনে নেওয়াই হোক- চীন-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ককে অবশ্যই পারস্পরিক লেনদেন ও ন্যায্যতার নীতির ভিত্তিতে চলতে হবে। উপপররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে এ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তুলতে পেরে আমি আনন্দিত।

আমি উত্তর কোরিয়ার শাসকদের প্রতি চাপ বজায় রাখার জন্য বেইজিংকে আহ্বান জানিয়েছি। বলেছি কূটনৈতিক সমাধানের পথ দ্রুতই বন্ধ হয়ে আসছে। এবং বেইজিংকে অবশ্যই তাদের ক্ষমতার মধ্যে পড়ে উত্তর কোরীয়দের এরকম নিষেধাজ্ঞা এড়ানোর ঘটনা ঠেকাতে হবে। চীনা সমুদ্রসীমার মধ্যে উত্তর কোরিয়ার জাহাজ থেকে জাহাজে কয়লা ও তেল সরবরাহ বন্ধ করায় ব্যর্থতা রয়েছে।

চীনে থাকা হাজার হাজার উত্তর কোরীয় অতিথি কর্মীকে ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে জাতিসংঘ অনুমোদিত ২২ ডিসেম্বরের সময়সীমা মেনে চলতেও আমি বেইজিংকে আহ্বান জানিয়েছি। এই কর্মীরা পিয়ংইয়ংয়ের রাজস্ব আয়ের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। বিষয়টি তেমন খবরে আসেনি। তবে এ ধরনের কর্মীরা- চীন, রাশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য বা আফ্রিকা যেখানেই হোক না কেন, ভয়াবহ ধরনের বঞ্চনার শিকার হয়। শ্রমিকের সুরক্ষার যে আন্তর্জাতিক মান রয়েছে তাদের অবস্থা তার বহু পেছনে।

আমি ফেনটানিল ইস্যু এবং যুক্তরাষ্ট্রে সৃষ্ট ফেনটানিল সংকটের বিষয়টি তুলেছি। চীনা সরকারের সাম্প্রতিক কিছু দেশের কথা উল্লেখ করে চীনকে মাদকদ্রব্য দমনে আরও সক্রিয় হওয়ার তাগিদ দিয়েছি। আমি মাদক হিসেবে ফেনটানিলের শ্রেণিবিভাগ পুরোপুরি প্রয়োগ করার জন্য চীনকে চাপ দিয়েছি। উপ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেংকে আমি নিউ ইয়র্ক টাইমস ম্যাগাজিনে সম্প্রতি প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের কপি দিয়েছি। প্রতিবেদনটিতে যুক্তরাষ্ট্রে ফেনটানিল মাদক সংকটে চীনের ভ'মিকার কথা বলা হয়েছে। আমি আপনাদের সবাইকে প্রতিবেদনটি পড়ে দেখতে বলবো। লেখাটি পড়লে বুঝবেন কেন যুক্তরাষ্ট্র সরকার, কংগ্রেস ও জনগণ সবার কাছে এটি একটি বড় উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠেছে।

ধৈর্য ধরে শোনার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ।

প্রশ্ন: আপনার উচিত আরও ছোট সফর করা (হাসির রোল)

পররাষ্ট্র দপ্তরের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা: আমি দুঃখিত। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম সব সোজাসাপ্টা রাখঢাক না করে বলে ফেলবো।

সঞ্চালক: ঠিক আছে ম্যাট! প্রশ্নটা কী?

প্রশ্ন: চীনাদের সঙ্গে কথা কি নিয়ে?

আমি আপনাকে কোরিয়া বিষয়ে প্রশ্ন করতে চাই। উত্তর কোরীয়রা আজ যা বলেছে তা কি ঠিক? এখানে আপনারা নাকি আলোচনা আবার শুরু করতে চান আগামী মাসে। আমার জানা ছিল আপনারা যত শিগগির সম্ভব আলোচনায় বসতে চাইছিলেন। কিন্তু এটা আপনার দিক থেকে কি একটা লক্ষ্য? তার পর আবার যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক মিত্রতার বিষয়ে খবর রটলো যে, আপনারা নাকি ওরা যে অর্থ দেয় তা পাঁচগুণ বাড়াতে বলেছেন। এটা কী একটি ভালো, ঘনিষ্ঠ ও অনুগত মিত্রের আচরণ?

পররাষ্ট্র দপ্তরের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা: উত্তর কোরিয়ার বিষয়ে এই প্রশ্নটা আমি সানন্দে বিশেষ প্রতিনিধি বিয়েগানের ওপর ছেড়ে দেবো। এর মধ্যে আমার ঢোকাটা ঠিক হবে না। বিষয়টা এমন ঘোলাটে যে তা খুব কাজের হবে না। কাজেই আপনারা যদি প্রশ্নটা বরং স্টিভ বিয়েগানকেই করুন।

স্পেশাল মেজার্স এগ্রিমেন্ট (এসএমএ) নিয়ে আলোচনার বিষয়ে বলবো, ট্রাম্প সরকার বরাবর যে কথাটা বলে আসছে -যা আমারও কথা-তা হচ্ছে এ অঞ্চলে নিরাপত্তা চিত্রের বদল হলে সম্পর্কও বদলায়। এটা উত্তর কোরিয়া ও অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত-- যেমন নিরাপত্তা ঝুঁকি ও হুমকি। সময় হলে আমরা এসব চুক্তি পর্যালোচনা করি। কাজের চাপ, ভারসাম্য ইত্যাদি বিষয়ে উভয়পক্ষের প্রতি ন্যায্য আচরণ নিশ্চিত করতে আমরা এগুলো হালনাগাদ করি। আলোচনার খুঁটিনাটি বিষয়ের কথা যদি বলেন, প্রকৃত সংখ্যা ও প্রক্রিয়ার কথাটা বলা আমার জন্য হবে খুবই বোকামি। তবে আমি মনে করি আপনারা সবাই এটা বোঝেন যে বোঝাটা ভাগাভাগি করে নেওয়া দুই দেশের স্বার্থের জন্যই ভালো। এটা নিশ্চিত করতে যাতে সম্পর্কটা ভারসাম্যপূর্ণ থাকে...এবং..

প্রশ্ন: বেশ..

পররাষ্ট্র দপ্তরের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা: আত্মমর্যাদা.. . আত্মমর্যাদাপূর্ণ।

প্রশ্ন: ঠিক আছে, কিন্তু ...ইয়ে.. .

পররাষ্ট্র দপ্তরের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা: আচ্ছা ঠিক আছে। বলুন।

প্রশ্ন: আপনি হংকংয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, আপনি চীনের কাছে সংযম অনুশীলনের গুরুত্ব জোরের সঙ্গে তুলে ধরেছেন। তারা সংযম না দেখালে যুক্তরাষ্ট্র কী করবে তা কি বলেছেন? যেমন ধরুন, তারা হংকংয়ে সেনাবাহিনী বা সশস্ত্র পুলিশ ইউনিট পাঠালো? যুক্তরাষ্ট্র কীভাবে সাড়া দেবে? চীনাদের আপনি কী বলেছেন এ বিষয়ে?

পররাষ্ট্র দপ্তরের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা: দেখুন, মনে হচ্ছে আপনি জানতে চাইছেন, আমরা ওদের একটা রেখা টেনে বলে দিয়েছি কিনা যে, এই দাগ পার হলে এই ঘটবে, সেই ঘটবে। আপনি নিশ্চয়ই বোঝেন সেটা খুব ভালো পদ্ধতি হবে না। অভিজ্ঞতা থেকে আমরা শিখেছি, কূটনীতিতে দ্ব্যর্থকতা একটি ভালো অস্ত্র। তবে আমাদের আগ্রহ নিয়ে বেইজিংয়ের মনে কোনো সন্দেহ নেই। আমরা সকল পর্যায়ে বলে আসছি, তাদের '৯৭ মেনে চলতে হবে, অর্থাৎ কিনা যৌথ ঘোষণাটি। সেখানে হংকংয়ের স্বায়ত্তশাসন অব্যাহত থাকার কথা আছে। তার অন্যথা হলে সমস্যা হবে। হংকং পলিসি অ্যাক্ট ও অন্যান্য আইনে এসব কথা লেখা আছে। কাজেই তারা ওই পরিণতির বিষয়ে সচেতন। সুতরাং এ নিয়ে বিস্তারিত বলার দরকার আছে বলে আমি মনে করি না। তবে এটুকু বলি, হংকং পলিসি অ্যাক্ট যদি পড়ে দেখেন তাহলে আপনারাও বুঝবেন। আমরা যদি মনে করি হংকংয়ের আর যথেষ্ট পরিমাণ স্বশাসন নেই তাহলে বড় রকমের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সমস্যা হবে।

সঞ্চালক: ক্যারল...

প্রশ্ন: রোহিঙ্গাদের সঙ্গে আরও ভালো আচরণ করা হবে এমন সুনির্দিষ্ট কোনো নিশ্চয়তা কি আপনারা বার্মা থেকে আনতে পেরেছেন? অথবা আপনারা এমন কিছু শুনেছেন যাতে করে আশ্বস্ত হয়েছেন যে, রোহিঙ্গাদের সঙ্গে শুধু ভালো আচরণই না, এসব মানুষকে মানবিক ও অন্যান্য সহায়তা দিতে আপনারা অভিগম্যতা বাড়ানোর যে কথা বলছেন তার সুযোগও তারা দেবে?

পররাষ্ট্র দপ্তরের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা : আচ্ছা। দেখুন...আমার ধারণা আমি কূটনীতিটা বেশ ভালোই বুঝি। তবে ব্যাপার হচ্ছে কী, এটি এমন একটি সমস্যা যা দীর্ঘদিন ধরে চলছে। আমরা অনেকদিন ধরে এটা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। এটি হুট করেই মিটে যাবে না। অং সান সু চির সঙ্গে আমাদের বৈঠকের সময় তিনি খুবই আন্তরিক ছিলেন। আমাদের অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে যা ছিল বেশ কার্যকর। স্বাভাবিকভাবেই রাখাইন রাজ্য এবং অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিষয়টি আলোচনায় উঠে এসেছে। সু চি আমাদের উদ্বেগের বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তাঁর - বার্মার দিক থেকে এ সমস্যার সমাধানের জন্য কাজ চলছে। আমার মনে হয়, আমরা সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, তাদের এ বিষয়ে আরও বেশি করা উচিত। প্রথমত পরিচয়পত্র ও নাগরিকত্বের বিষয় দুটো দেখা। এ ছাড়া রয়েছে সাত

বছরের বেশি সময় ধরে আশ্রয় শিবিরে থাকা মানুষদের দুর্দশার বিষয়টি। এ সবগুলো বিষয়ের সুরাহা করতে হবে।

সুতরাং সহসাই...রাতারাতি এ সমস্যার কোনো সমাধান হবে না। তবে আমি মনে করি, কূটনৈতিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে বিষয়টি নিয়মিতভাবে তুলে ধরাটা গুরুত্বপূর্ণ। আর তাই আমরা এটাই করেছি। সু'চি আমার বক্তব্য গ্রহণ করেছেন। আমরা এখন এগিয়ে যাবো। এ নিয়ে কাজ চালিয়ে যাবো।

সঞ্চালক: শ্যন।

প্রশ্ন: আমি এ বিষয়েই প্রশ্ন করতে চাই। গতকালের খবর, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত মিয়ানমারের বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণ করছে। আর্জেন্টিনায়ও আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ভাবনা কী? যুক্তরাষ্ট্র কি মনে করে এটি জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার একটি কার্যকর উপায় হতে পারে?

পররাষ্ট্র দপ্তরের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা: আমি বলবো এটি মাত্র গত রাতের খবর। জাম্বিয়া, তারপরে - বেসিন - ওআইসি এর জন্য চাপ দিচ্ছে। আমি মনে করি, এই সমস্যাটি তুলে ধরার জন্য এবং এ নিয়ে এগোবার জন্য আমরা যা কিছুই করি তা কাজে আসবে। তো আমি মনে করি, সেই প্রক্রিয়াটি... আমি আইসিসিতে যাওয়াটা সঠিক উপায় কিনা তা নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না। শুধু বলব, এই ইস্যুটি তুলে ধরা এবং নেপিডোর সরকারকে ব্যবস্থা নিতে চাপ দেওয়াটা জরুরি। আমি আশা করি, এ ধরনেরই আরেকটি ঘটনা শিনজিয়াংয়ের সংকটের দিকে একই রকম মনোযোগ দেওয়া হবে। সেখানেও একটি মুসলিম জনগোষ্ঠী রয়েছে যারা শুধু মুসলমান হওয়ার জন্যই ভয়ানক রকমের দুর্দশার মধ্যে আছে। তাই এই সবগুলো বিষয়ের দিকেই মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

সঞ্চালক: কনর।

প্রশ্ন: আমার প্রশ্নও এই বিষয়টি নিয়েই। (মিয়ানমার) সরকার জবাবদিহির ক্ষেত্রে বা বাংলাদেশ থেকে রোহিঙ্গাদের নিরাপদ, স্বেচ্ছামূলক ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে অগ্রগতিতে সত্যিই বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাহলে অর্থনৈতিক সম্পর্কের দিকে কেন এগিয়ে যাচ্ছেন? কোন ধরনের - আপনি কি মনে করেন না এটি একটি ভুল বার্তা দিচ্ছে, যখন কিনা যুক্তরাষ্ট্রের বরং দেশটির সরকারের ওপর আরও চাপ সৃষ্টি করাই উচিত- হয়তো অর্থনীতিকে একটা শর্ত হিসাবে ব্যবহার করে?

পররাষ্ট্র দপ্তরের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা: আচ্ছা। আইডিপি ক্যাম্পগুলোতে (অভ্যন্তরীণভাবে উদ্বাস্তুদের শিবির) আমরা যেসব কথা শুনেছি তার একটা হচ্ছে, সেখানে চাকরি-বাকরির অভাব। তাদের কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। তারা কেবল খাবার বা অন্যান্য সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকে। এটা একটা ভয়ঙ্কর জীবনযাপন। সুতরাং আমি বোঝাতে চাইছি যে, আপনি নানাভাবেই এখানে কাজ করতে পারেন। আমার কাছে মনে হয়, সেখানে কলকারখানা স্থাপন করে এক ধরনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটানো যায়। বার্মার নিজস্ব শিল্প বিকাশের মাধ্যমে বা বাইরে থেকে শিল্প এনে- যে কোনোভাবেই অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে উঠতে পারে। এর মাধ্যমে অন্তত কিছু কাজের বন্দোবস্ত হবে যা এসব মানুষের জীবনধারনের জন্য সহায়ক হতে পারে। যেখানে অর্থনৈতিক চাপ থাকে সেখানে অনেক সময়

রাজনৈতিক চাপও দেখা দেয়। উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য আমরা যত বেশি করতে পারি ততই ভালো। তবে যেমনটি আমার বিবৃতিতে বলেছিলাম, এজন্য সামরিক বাহিনীকে অর্থনীতির বাইরে নিয়ে আসতে হবে এবং এটি এবং অবশ্যই রাজনৈতিক ব্যবস্থাকেও কার্যকর করতে হবে। আমরা এ অঞ্চলে যা দেখে অভ্যস্ত ছিলাম অনেকটা সে জায়গায় ফিরে যেতে হবে।

প্রশ্ন: আপনারা কী তাদের (বার্মা সরকার) কাছ থেকে এমন কোনও আশ্বাস পেয়েছেন যে তারা উত্তর রাখাইন রাজ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অনুমতি দেবে? ওখানে উন্নয়নে বাধা দিচ্ছে সরকার। বা তারা কী বলেছে যে, সামরিক বাহিনীকে অর্থনীতি থেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করবে? আপনি কীভাবে এই ধরনের বিষয়কে সহায়তা বা উন্নয়নের সঙ্গে শর্তযুক্ত করতে পারবেন?

প্রশ্ন: এই অর্থ যে যেজন্য বরাদ্দ তাতেই ব্যবহার করা হচ্ছে সে বিষয়ে আপনার ভরসা কতোটা?

পররাষ্ট্র দপ্তরের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা: বিনিয়োগ সম্পর্কে ভালো বিষয়টি হলো এটি সরকারের পকেটে যায় না। ভবন নির্মাণ এবং যন্ত্রপাতির পেছনে যায়। এর মাধ্যমে অনেক মানুষের কর্মসংস্থান হয়। সুতরাং মনে হয় সরকারের কাছে সরাসরি অর্থ দেওয়ার পরিবর্তে মিয়ানমারে ব্যবসা ও শিল্প খাতে বিনিয়োগ করা একটা ভালো উপায়। আর প্রাকৃতিক সম্পদে মিয়ানমার খুবই সমৃদ্ধ। তারা সেখানে অনেক কিছু করতে পারে। তবে স্পষ্টতই এর জন্য একটি সুরক্ষিত ভিত্তি প্রয়োজন। আর এটি একটি উদ্বেগের বিষয়। তবে আবারও বলবো, সেখানে প্রচুর সুযোগ আছে। আমরা তাদের সাথে এ নিয়ে কাজ করার অপেক্ষা করছি। এ ব্যাপারে ধৈর্য ধরার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যেমনটি বরাবরই বলা হয়েছে।

সঞ্চালক: আপনার নাম?

প্রশ্ন: সারা অ্যামপোলস্ক, কিয়োডো নিউজ। আমি আপনাকে জিএসওএমআইএ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে চাই। আপনি আগে কোরিয়ার নতুন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বৈঠকের কথা উল্লেখ করেছিলেন। কোরীয়রা এখনও বলছে যে তারা চুক্তির বর্তমান মেয়াদ শেষে বেরিয়ে আসারই কথা ভাবছে। আমি জানি টোকিও আর সিওলে থাকাকালীন আপনি এ বিষয়ে অনেক কথা বলেছেন। তখন বা এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে আর কোরীয়দের তরফে কোনো পরিবর্তন দেখেছেন? বিশেষত আজ সকালের সভায় এ নিয়ে কিছু হয়েছে? তারা কি আদৌ প্রভাবিত হয়েছে না কি, সত্যিই আপনাকে বলছে যে, ২২ তারিখের পর চুক্তি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কথাই ঠিক রয়েছে?

পররাষ্ট্র দপ্তরের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা: আমি অবশ্যই এই প্রশ্নটি কোরীয় এবং জাপানিদের দিকে ঠেলে দেব। যেমনটি আমি আগেই বলেছি, এটি একটি দ্বিপক্ষীয় ইস্যু যা শুরু হয়েছিল কোরিয়ায় জোরপূর্বক শ্রমের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে। তারপরে এর বেশ কয়েকটি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে সাম্প্রতিকতম প্রতিক্রিয়াটি (এবং যাতে যুক্তরাষ্ট্র যুক্ত) হচ্ছে জিএসওএমআইএ।

আমরা যা করছি তা হচ্ছে তাদের একসঙ্গে কাজ করতে উৎসাহিত করা। এ বিষয়ে মাঝখানে থেকে দূতিয়ালি করা... আপনারা জানেন, যুক্তরাষ্ট্র বরাবরই বলে এসেছে এতে আমাদের কোনো লাভ নেই। এতে তাদেরও উপকার হবে না। তাদের একত্রে বসে আরও আলাপ-আলোচনা করা দরকার। তাদের নিজেদেরই এই বিষয়গুলোর সমাধান করতে হবে। এটাকে উৎসাহিত করতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি- এসব আলোচনা এবং...

প্রশ্ন: কিন্তু আপনারা যে জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে দ্বিপক্ষীয় আলোচনাকে উৎসাহিত করার জন্য কাজ করছেন, আপনার উদ্যোগের কোনো প্রতিফলন কী এ পর্যন্ত দেখতে পেয়েছেন?

পররাষ্ট্র দপ্তরের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা: হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি। মানে, বিষয়টি তুলে ধরতে আমি নৌ বাহিনীর একটি রূপক ব্যবহার করতে চাই: দীর্ঘ সময় ধরে জাহাজের সামনের দিকটি ডুবছিল। কিন্তু এখন সম্মুখভাগ আবার ওপরের দিকে উঠতে শুরু করেছে। জাপানের সম্রাটের সিংহাসনে বসার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে কোরীয় প্রধানমন্ত্রীর টোকিও সফরের মধ্য দিয়ে এর সূচনা। তারপরে অতিসম্প্রতি, পূর্ব এশীয় শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী এবং প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক হয়েছিল। ওই সাক্ষাতের যেসব ছবি দেখেছি তাতে নেতাদের ইতিবাচক ও হাস্যোজ্জ্বল দেখা গেছে। তো এই হচ্ছে অবস্থা। কাজেই এখন যেটা দরকার তা হচ্ছে কেবল একটা সূচনা, ঠিক আছে? তাদের এখন এমন কিছু দরকার যা সম্পর্ককে আবার সামনের দিকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করবে। তাই আমরা এই বিষয়ে আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। আমি আশাবাদী। তবে আমি যেমনটি বলেছিলাম, আমি সম্ভবত বিষয়টির সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠ। তাই আমি তাদের এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করব।

সঞ্চালক: নাইক!

প্রশ্ন: হ্যাঁ, হংকংয়ের সর্বশেষ অবস্থা নিয়ে প্রশ্ন। পুলিশ এবং বিক্ষোভকারীদের মধ্যে সংঘাত সম্প্রতি ভয়ানক দিকে মোড় নেওয়ার প্রেক্ষাপটে আপনাদের হিসাবে কোনও মানবিক সমাধানের সুযোগ কি ম্লান হয়ে যাচ্ছে? জেং জেগুয়াংয়ের সঙ্গে আপনার আলোচনা থেকে চীন আগামীতে কী করতে যাচ্ছে বলে মনে হয়েছে? ধন্যবাদ।

পররাষ্ট্র দপ্তরের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা: যুক্তরাষ্ট্র বরাবর বলে আসছে যে, সবার আগে সহিংসতা বন্ধ হতে হবে। কোন সহিংসতাটি কে শুরু করেছিল তা নিয়ে কাদা ছোড়াছুড়ির অর্থ নেই। এখানে কত বিষয়ই না কাজ করছে! অসংখ্য কারণ থাকতে পারে। সোজাসাপ্টা কথা হলো: সহিংসতা বন্ধ করতে হবে। কথা শেষ। কোন পক্ষ দায়ী তা বিবেচ্য বিষয় নয়। আমি মনে করি উভয়পক্ষেই উস্কানিদাতা আছে। আর কে বলে যে এই সহিংসতার দুইটি পক্ষ আছে ? আমার মনে হয় এতে তিন বা চারটি পক্ষ আছে। সহিংসতা এড়ানো গেলে বিক্ষোভের বিষয়টি মোকাবেলা করা যেতে পারে। আপনাদের স্মরণ থাকতে পারে যে, একটি আইন নিয়েই প্রতিবাদটি শুরু হয়েছিল যাতে হংকংয়ের লোকদের বিচারের জন্য মূল ভূখণ্ডে প্রত্যর্পণের ব্যবস্থা ছিল।

অতীতেও এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। হংকংয়ের বই বিক্রেতাদের ঘটনাগুলোর কথা মনে করুন। প্রত্যর্পণ আইনসহ বা ছাড়াই মানুষকে জোর করে হংকং এবং অন্যান্য স্থান থেকে বিচার ও শাস্তির জন্য চীনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আর তারা সদ্য তাইওয়ানের একজন অধ্যাপক সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে যে, তাকে কিছুদিন ধরে আটক রাখা হয়েছে। এবং তাই আমি সাধারণভাবে বলবো, আমরা আরও স্বচ্ছ একটি আইনি ব্যবস্থা দেখতে চাই। আমি মনে করি হংকংয়ের অধিবাসীরাও সেটাই চায়।

কিন্তু এবার আসুন সমস্যার মূল কারণগুলোতে ফিরে যাই। এই প্রত্যর্পণ আইনটিকে হংকংয়ের জনগণ তাদের সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বিবেচনা করছে যা কিনা যৌথ বিবৃতি এবং অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। সুতরাং প্রথমে আসুন, সহিংসতা বন্ধ করুন, বিক্ষোভের দিকে দৃষ্টি দিন, মানুষের সঙ্গে আলোচনা করুন। কোন এক ধরনের সমাধানে পৌঁছানোর জন্য হংকং সরকার এবং বেইজিং কর্তৃপক্ষকে আমরা বরাবর এই পরামর্শই দিয়ে আসছি।

সঞ্চালক: আমি মনে করি আপনার আর একটি প্রশ্নের জন্য সময় আছে। বেন!

প্রশ্ন: যুক্তরাষ্ট্র কি কোনো এক পর্যায়ে বিক্ষোভকারীদের সহায়তা করতে যাচ্ছে?

পররাষ্ট্র দপ্তরের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা: - এই প্রশ্নটি মাত্রই জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তবে এই মুহূর্তে সবচেয়ে যথাযথ কাজ হবে এই সহিংস প্রতিবাদের পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ সংলাপের একটি ভিত গড়ে তোলা। কিছু সহিংসতার ঘটনা বোধগম্য। তবে এসব ফলপ্রসূ নয়। এতে কোনো কাজ হয়না। আমরা হংকং পক্ষকেও তা জানিয়েছি ...এবং -

সঞ্চালক: আমরা দিনদুয়েক আগে এ নিয়ে একটি বিবৃতি দিয়েছি।

পররাষ্ট্র দপ্তরের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা: হ্যাঁ।

সঞ্চালক: বেন।

প্রশ্ন: আমি একটি বিষয়ে আপনাদের ভাবনা জানতে চাই। আগামী সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী আবে জাপানের সবচেয়ে বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় থাকা প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন। জাপানে এ ধরনের একটানা, স্থিতিশীল প্রশাসন থাকাটা যুক্তরাষ্ট্র-জাপান সম্পর্ককে কতটা সহায়তা করে?

পররাষ্ট্র দপ্তরের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা: এটা একটা কৌতুহলকর বিষয়। আমি জানতাম যে বিষয়টা আসতে যাচ্ছে। তবে তা এত শিগগিরই তা জানতাম না। বেশ...আর প্রথমত এই দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকার জন্য আবেকে অভিনন্দন। জাপানের অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে এটাকে খুব ইতিবাচক বিষয় হিসেবেই দেখছি। যুক্তরাষ্ট্রের জন্য... অবশ্যই সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা এবং ধারাবাহিকতা ভালো বিষয়। তবে এর অর্থ এই নয় যে, আমরা বিশেষ একজন প্রার্থীকে সমর্থন করি। গণতান্ত্রিক নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় যদি অন্য কোনো প্রার্থী নির্বাচিত হন, আমরা গণতন্ত্রের প্রক্রিয়াটিকে সমর্থন করি এবং ফলাফল যার পক্ষেই যাক তা মেনে নিই। আর তাই যে বার্তাটি আমরা অনেক জায়গায় জানিয়ে দিচ্ছি তা হলো - আমরা কোনো বিশেষ প্রার্থীকে সমর্থন করতে পারি না।

২০২০ সাল বড় বড় নির্বাচনের বছর। আগামী জানুয়ারি মাসে আছে তাইওয়ানের নির্বাচন। নভেম্বরে দুটি বা তিনটি আছে। আমরা এগুলোর কয়েকটি পর্যালোচনা করেছি।

প্রশ্ন: এখানেসহ।

পররাষ্ট্র দপ্তরের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা: হ্যাঁ, এবং আমাদেও নির্বাচন। এগুলো বিরোধপূর্ণ হতে পারে - কখনও কখনও অস্বস্তিকরও। তবে এ প্রক্রিয়াটি সংরক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অন্য কিছু কিছু দেশে কী রকম বিকল্প আছে তা তো আমরা দেখছিই। কাজেই...।

সঞ্চালক: ঠিক আছে তাহলে। আমাকে এবার আপনাকে উদ্ধার করতে হবে এখান থেকে। নাহলে আমি সমস্যায় পড়বো।

প্রশ্ন: আমি কি -

প্রশ্ন: আপনি যেহেতু তাইওয়ানের নির্বাচনের কথা বলেছেন, নির্বাচনের দুই মাস পর আপনি এখন বেইজিংয়ের আচরণকে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন? নির্বাচনের ফলাফলকে প্রভাবিত করার চেষ্টার কোনও ইঙ্গিত আছে কি?

পররাষ্ট্র দপ্তরের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা: আমার তা মনে হয় না। বেইজিং এ নিয়ে যে অনেক কথা বলেছে তেমনটা দেখছি না। তবে নেপথ্যে কিছু ঘটছে কিনা, আমি সত্যিই সে বিষয়ে কিছু বলতে পারবো না। তবে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ ছাড়া নির্বাচন হতে দিতে আমরা আবারও বেইজিংয়ের প্রতি আহ্বান জানাবো। কারণ হস্তক্ষেপের ফলে কী হয় তা অতীতে আমরা দেখেছি। হয়তো তারা যা পরিকল্পনা করে তা সবসময় পুরোপুরি কার্যকর হয় না।

ধন্যবাদ ।